দৈনিক সংবাদ
তারিখ 25 AUG 1993
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

শিক্ষার উন্নয়নে জাতীয় অঙ্গীকার

অধ্যক্ষ ডঃ মালিহা খাতুন

(শেষাংশ)

আমাদের দেশের শিক্ষার পরিবেশ মোটেই অনুকূল নয়–শুধু এ কথা বললেই যথেষ্ট হবে না, বরং শিক্ষার পরিবেশ বলতে আমাদের মনে ভেসে ওঠে একটা বীভৎস ভয়াবহতা ও নিষ্করুণ নিদারুণতার ছবি। প্রাকৃতিক জগতে জ্যোৎস্না ও অন্ধকারের ন্যায় মানবের অন্তর্জগতে মধুর ও ভীষণের প্রতি প্রবণতা. পাশাপাশি বা পর্যায়ক্রমে প্রবাহিত। মানুষ এদের মধ্যে কোন্ পথটি অবলম্বন করবে, তা অনেকটা নির্ভর করে মানুষের রুচি, আদর্শ ও যুগ–প্রভাবের ওপর। এক এক যুগে মানুষ সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত সৌন্দর্যের পথ পরিত্যাগ করে উৎকট বিভীষিকার প্রতি আকৃষ্ট হয়। বর্তমানে আমরা এক বিশৃঙ্খলা ও সঙ্কটের সময় অতিক্রম করে চলেছি– মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নিচে, বিপর্যয়ের ভূমিকম্পে থরথর কম্পমান দেশের ওপর দাঁড়িয়ে আমরা কেবল ঘনকৃষ্ণ ভয়ঙ্কর–কালো রূপটিই দেখতে পাচ্ছি। যার ফলে শিক্ষাঙ্গনে চলছে ফাঁকি–প্রবঞ্চনা, নৈরাজ্য– নৈরাশ্য, অস্ত্রের ঝনৎকার ও অনিশ্চয়াত্মক টলটলায়মান অবস্থা। আমাদের গোটা ছাত্রসমাজ এই উৎকট বিভীষিকার শিকার হচ্ছে এবং শিক্ষক, অভিভাবক ও দেশের ভাগ্যনিয়ন্তাগণ যেন নীরব দর্শকের মত তা কেবল অবলোকন করে চলেছেন। শিক্ষাদান ও গ্রহণকে কার্যকরী, অর্থবহ ও সুফলদ করে তুলতে হলে তার পূর্বশর্ত হিসেবে চাই অনুকূল পরিবেশ। আমাদের চিহ্নিত প্রতিকূলতাকে অপনোদন করে এমন একটি পারিপার্শ্বিক ভাবাসঙ্গের সৃষ্টি করতে হবে, যার অপরূপত্বে শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেই বিমুগ্ধ ও বিমোহিত হবে এবং অনিশ্চয়াত্মক ও বিভীষিকাময় ভাব–বিহ্বলতার কুহেলিকাজাল থেকে সত্যের সূর্যালোককে উদ্ধার করতে ব্রতী হবে। এই নব পরিবেশ সৃজনে আমাদের শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, শিক্ষাদার্শনিক, শিক্ষাপ্রশাসক, চিন্তাবিদ, গবেষক ও সাংবাদিকগণকে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে।

শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়ন সম্পর্কে বিশেষভাবে আরও দু'–চারটি কথা বলা যেতে পারে। শিক্ষা একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া ও পরিক্রমণ। মাতৃজঠর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত (from womb to tomb)–এর ব্যাপ্তিকাল। সুতরাং মাতৃজঠরে শিশুর প্রথম অস্তিত্বের লক্ষণ থেকেই মায়ের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ পরিবেশ সুন্দর ও সুষমামন্ডিত করে তুলতে হবে। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার চারপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন, রুচিসঙ্গত ও রূপময় করে গড়ে তুলতে হবে। কারণ শিক্ষার প্রবণতা ও মনস্তত্ত্ব অনুসরণ করে বলা যায় মর্তের আলোকে বিস্মিত দু'টি সুন্দর কচি চোখ মেলবার শুভক্ষণ থেকেই তার প্রাথমিক স্তরের শুরু। তাই দেখা এবং সঙ্গে সঙ্গে শোনা থেকেই শিশুর শিক্ষা আরম্ভ হয়। এরপর তার মুখে বোল ফুটে। তখন মা, গৃহ–পরিবেশ, নিকট পরিবেশ ও বাইরের জগতের সঙ্গে তার পরিচয় শুরু হয় দেখা, শোনা ও কথা বলার চেষ্টার ভেতর দিয়ে। এই সময় শিশুর পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা সম্পাদনের দিকে সকল রকম সম্ভাব্য সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ শিশুর এই দেখা, শোনা ও অস্ফুট ধ্বনির সঙ্গতিরূপ পরবর্তী সারাজীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্বের সুন্দর পটভূমি রচনা করে। শুধু তাই নয়, অবচেতন মনের বুনিয়াদও সেই সঙ্গে নির্মিত হয়। মানুষের স্বভাব সঙ্গত, পরিচ্ছন্ন, পরিশীলিত ও সুষম ব্যক্তিত্বের প্রকাশ, বিকাশ ও কার্যকলাপের সুসঙ্গতি ও স্বাভাবিকত্ব অবচেতন মনের সুষমতা এবং রুচিবোধের ওপর একান্তে নির্ভর করে। 'মস্তিষ্কের অসংখ্য ভাঁজের স্তরবিশেষে জন্ম থেকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সকল কথা ও দৃশ্যরূপের নিখুঁত ছবি সবাক চলচ্চিত্রের ফিল্মের ছবি ও শব্দ তোলার মত গৃহীত ও রক্ষিত হয়ে থাকে'। তাই শিশুর বুনিয়াদি শিক্ষার পত্তনের দিকে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি না দিলে তার ভবিষ্যৎ জীবনের বিকাশ ও ব্যাপ্তি এবং পরিপূর্ণতা কখনই স্বাভাবিক ও আশানুরূপ হবে না। এ জন্য প্রথম থেকেই শিশুর চারদিকের দৃশ্য–ছবি, গন্ধ–গানের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে হবে। ভাবময় যে বিশ্বজনীন সত্য এবং সম্ভাবনা তার ভেতরে সুপ্ত ও প্রচ্ছন্ন রয়েছে, তার দ্বারাই গৃহে পিতা–মাতা এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষক–শিক্ষিকা যথোপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলবেন। এর ফলে শিশুর সচেতনতা সুন্দর ও মঞ্জু–সুষমরূপে বৃদ্ধি ও ব্যাপকতা লাভ করে এবং জীবন ও জগতের সঙ্গে তার একটি রূপস্বচ্ছ সম্পর্ক স্পষ্ট ও মধুর হয়ে ওঠে। এই পরিবেশে লালিত ও বর্ধিত হতে পারলে শিশু আপনাকে ক্রমাগত আবিষ্কার করে একটি পূর্ণাঙ্গ–সুন্দর মানুষে পরিণত হবে। এরূপে অনুকূল অবস্থা ও পারিপার্শ্বিকের মধ্যে থেকে শিশু আপনাকে চিনতে, জানতে ও আনন্দের ভেতর দিয়ে প্রকাশ করে ক্রমশ জগৎ ও জীবনের উপলব্ধির গভীরতায় পৌছায়। এটা নিঃসন্দেহে একটি দীর্ঘ বিলম্বিত বিবর্তন। এই বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তাকে গড়ে তুললে সে কখনও বিভ্রান্ত ও প্রলুব্ধ হয়ে শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্য সৃষ্টির পথে পা বাড়াবে না। এ জন্য চাই শিক্ষকের সজাগ দৃষ্টি, আন্তরিক সদিচ্ছা ও তপশ্চরণ। বস্তুত একটি অনুকূল শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তুলতে হলে তাকে ধর্মে, কর্মে, ব্যক্তিত্বে, সাধনায়, আরাধনায় আত্মনিবেদন করতে হবে।

আমাদের দেশের শিক্ষিতের হার শতকরা মাত্র ২০ জন। এদের মধ্যে প্রকৃত অর্থে শিক্ষিতের হার ১০ জনের বেশি হবে না, আবার এই ১০ জনের শিক্ষার মানও নেহায়েত নিম্ন পর্যায়ের। এ থেকেই আমাদের দেশের শিক্ষার মানের করুণ চিত্রটি ফুটে ওঠে। আজকাল অনেক ছাত্র–ছাত্রী 'স্টার মার্ক' পেয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছে, কিন্তু তাদের বিদ্যাবত্তা মূল্যায়ন করতে গেলে দেখা যায়, তারা শুধু উচ্চ নম্বর প্রাপ্তির প্রতিযোগিতায়ই নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিল, প্রকৃত শিক্ষা অর্জনের জন্য নয়। বস্তুত আজকাল শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকগণ কি করে একটি 'সামাজিক মর্যাদার অভিজ্ঞানপত্র' পাওয়া যায়, সেদিকেই ঝুঁকে পড়েছে, জ্ঞানার্জনের প্রতি তাদের মোটেই আগ্রহ নেই। এই সামাজিক মর্যাদার 'অভিজ্ঞানপত্র' লাভের জন্য আজকাল গৃহ–শিক্ষকতা, কোচিং সেন্টার, ব্যাচ করে পড়ানো, ইত্যাকার নানা পথ অবলম্বিত হচ্ছে। ফলে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হচ্ছে এবং শিক্ষার মান ক্রমশ নিম্নগামী হচ্ছে। শ্রেণী–পাঠনায় শিক্ষকের অবহেলা ও ফাঁকি দেয়া থেকে গৃহশিক্ষকের দ্বারস্থ হওয়ার পথের উদ্ভব ঘটেছে। এই ফাঁকি ও অবহেলা এখন এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, বিদ্যালয়ের বিকল্প হিসেবে এখন কোচিং সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও তা দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে। এই সেন্টারসমূহে উচ্চ নম্বর প্রাপ্তির পথ বাৎলিয়ে দেয়া হয়, সম্ভাব্য প্রশ্ন বলে দেয়া হয়, নোট দিয়ে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রকে সংকুচিত করা হয়। বিদ্যা এখানে পণ্য হিসেবে বেচাকেনা হয়। শুধু কোচিং সেন্টারের কথাই বা বলি কেন? সমগ্র দেশের বিদ্যালয়গুলোতেই এখন একটি ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি 'শিক্ষা' নামের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়েছে। ফলে ছাত্র–শিক্ষকের মধ্যে এখন সেই মধুর ও মর্যাদাজনক সম্পর্কটি আর নেই। সেখানে বিক্রেতা ও ক্রেতার একটি প্রাণ–রসহীন কুহক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। এককালের গুরুগৃহের শিক্ষা এখন শিষ্যগৃহে গিয়ে মাথাকুটে মরছে। গুরুর আশ্রমে এককালে শিষ্য আশ্রিত হয়ে শিক্ষা গ্রহণ করত, এখন গুরু শিষ্যের আশ্রিত হচ্ছে। শিক্ষকের জন্য এটা সত্যি অত্যন্ত মর্যাদাহানিকর। এর সুদূরপ্রসারী ফল অত্যন্ত মারাত্মক। শিক্ষার্থীরা যে শিক্ষকের উপদেশ–নির্দেশ উপেক্ষা করে শিক্ষাঙ্গনকে রণাঙ্গনে পরিণত করেছে, তার অন্যতম কারণ এখানেই খুঁজে পাওয়া যাবে। শিক্ষকের শ্রেণী–পাঠনায় অবহেলা প্রদর্শন ও ফাঁকি দেয়ার প্রবণতার পেছনে অবশ্য কতকগুলো বাস্তব কারণও রয়েছে। অনেক বিদ্যালয়ে ছাত্র–ছাত্রীদের সংখ্যাধিক্যের ফলে শ্রেণীতে ছাত্র–শিক্ষক সংখ্যানুপাত নির্ধারিত সীমা বহদূর ছাড়িয়ে যায়, ফলে শ্রেণী–পাঠনা ফলপ্রসূ হতে পারে না। অনেক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের দৈনন্দিন ক্লাসের সংখ্যাও অনেক বেশি। বহু বিদ্যালয়ে দুই শিফট এমনকি তিন শিফট চালু হওয়ায় ক্লাসের সময়সূচীতে সময় বন্টন করতে গিয়ে প্রতি ক্লাসের জন্য অনেক ক্ষেত্রে ৩০ মিনিটের বেশি সময় দেয়া সম্ভব হয় না। শিক্ষকদের বেতন প্রায় ক্ষেত্রেই তাদের জীবন–ধারণ–উপযোগী নয়। ফলে বাড়তি আয়ের জন্য তাদের গৃহশিক্ষকতার পথ বেছে নিতে হয়। শ্রেণী–পাঠনা যথাযথ এবং কার্যকরীভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এই সকল কারণ সুচিন্তিত প্রকল্প প্রণয়নের মাধ্যমে দূরীভূত করতে হবে।

শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য আরও কতকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আমাদের শিক্ষার বর্তমান মূল্যায়ন–ব্যবস্থায় যথেষ্ট ত্রুটি রয়েছে। কথায় বলে, 'বিদ্যার মূল্যায়ন কঠিন, শিক্ষার মূল্যায়ন কঠিনতর, শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন কঠিনতম'। নানা চিন্তা–ভাবনার পর মাধ্যমিক স্তরের মূল্যায়ন–ব্যবস্থায় রচনামূলক পরীক্ষার পাশাপাশি নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। কিন্তু এতেও প্রত্যাশিত ফল দর্শিত হচ্ছে না বলে অনেকের ধারণা। কাজেই শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন ব্যবস্থা পুনর্বিবেচনা করতে হবে। নইলে মূল্যায়ন ব্যবস্থার এ ধারা চলতে থাকলে শিক্ষার মান আরও অধোগামী হবে, এমন আশঙ্কা অমূলক নয়। শ্রেণীতে সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক 'ক্লাস–টেস্ট' নেয়ার ব্যবস্থা এবং তাতে নম্বর প্রদানের ব্যবস্থা এবং সেই নম্বর এস, এস, সি পরীক্ষায় যোগ করার ব্যবস্থা করলে লেখাপড়ার মান অনেকাংশে উন্নত হতে পারে। পাঠদানে শিক্ষকের সফলতা–বিফলতাকে পুরস্কৃত ও তিরস্কৃত করার কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। শিক্ষকদের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে এবং ব্যর্থ শিক্ষককে সংশোধন অথবা প্রয়োজনবোধে অপসারণ করতে হবে। প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষক কখনও ভাল শিক্ষক হতে পারেন না। কেউ কেউ জন্মগতভাবে সুশিক্ষক (born teacher) হতে পারেন, কিন্তু তাদের সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়, তাদের দ্বারা আমাদের বিপুলসংখ্যক শিক্ষকের চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। তাই প্রশিক্ষণের দ্বারা যোগ্য শিক্ষক গড়ে তুলতে হবে, শিক্ষকের অযোগ্যতাকে অপসারিত করতে হবে। পরীক্ষায় উচ্চ নম্বরপ্রাপ্তির চেষ্টায় বাড়াবাড়ির পেছনে কতকগুলো কারণ রয়েছে। সামাজিক মর্যাদার কথা আগেই বলেছি। ভাল কলেজে, মেডিক্যাল কলেজে, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হলে উচ্চ নম্বর পাওয়া চাই। এ জন্য উচ্চ নম্বর পাওয়ার জন্য শিক্ষার্থীরা যতটা প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে, প্রকৃত শিক্ষালাভের জন্য তার শিয়দংশ সময়ও ব্যয় করে না। এ জন্য উচ্চ শিক্ষার জন্য ভর্তির ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের প্রকৃত শিক্ষা ও মেধা যাচাই করা বাঞ্ছনীয়। পরীক্ষায় নম্বর প্রদানের পরিবর্তে 'গ্রেডিং প্রথা' চালু করলে ১টি–২টি নম্বরের জন্য শিক্ষার্থীরা আর হন্যে হয়ে ছুটে বেড়াবে না। পাঠ্য–পুস্তকের শুষ্ক জ্ঞানমূলক বিষয়ের প্রতিই কেবল শিক্ষার্থীদের নিবদ্ধ না রেখে আধুনিক যুগের নব নব জ্ঞান অন্তরঙ্গ আনন্দময়তার মধ্য দিয়ে তাদের নিকট পরিবেশন করতে হবে। এ প্রয়াসগুলো অবলম্বন করলে আমাদের শিক্ষার মান ধীরে ধীরে অথচ সুনিশ্চিতভাবে উন্নত হবে, এমন আশাদুরাশানয়।।

শিক্ষা জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশের সিংহদ্বার, আর জ্ঞানই মানুষের সত্য ও সুন্দর পথে অভিযাত্রার চালিকাশক্তি। কিন্তু আজ চারদিকে এলোমেলো, উদ্‌ভ্রান্ত বাতাসে শিক্ষার পরিবেশ অস্থির, কম্পমান। হয়ত এটা পরিবর্তন যুগের অপরিহার্য লক্ষণ–ভবিষ্যতের নব সংশ্লেষশক্তির পূর্বগামী অবস্থা। এই বিচলিত ভারসাম্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শিক্ষার জ্যোতির্ময় সৌররশ্মির আলোকে সমুদ্ভাসিত করাই হোক আমাদের আজকের জাতীয় অঙ্গীকার।